গ্রন্থাগারের
রূপ
ও
বিকাশ

—লেখকের অন্যান্য বই—

- ভারত-শিল্প—ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৫৯
- গ্রন্থাগার—বিশ্বভারতী, ১৩৬০
- A Practical Guide to Library Procedure—Asia Publishing House, Bombay, 1956
- ভারত-শিল্প (হিন্দী)—ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯৫৮
- পুস্তকালয় কার্যপদ্ধতি কা ব্যবহারিক জ্ঞান (হিন্দী)—এসিয়া পাবলিসিং হাউস, বোম্বাই, ১৯৫৯

গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশ

বিমলকুমার দত্ত

গ্রন্থাগারিক

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

রীডার্স কর্নার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

মূল্য ১·৭৫ টাকা

শিল্পী

শ্রীসন্মথ মিত্র

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

"লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ"

—রবীন্দ্রনাথ

মুখবন্ধ

গ্রন্থাগার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের দান অপরিসীম।

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার-আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে; ক্ষীণ হলেও এ আন্দোলন খুব আশাপ্রদ ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ। এই অন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের জন্য আবশ্যক জনগণের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি। জনমানসে চেতনা জাগিয়ে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করতে হ'লে গ্রন্থাগারের কর্মসূচীর ধারা উপধারা সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা কর্তব্য। —সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই বই। সর্বসাধারণের জন্য সহজ ও সুগম ভাষায় গ্রন্থাগার অন্দোলনের ধারা, গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশের কয়েকটি মূলসূত্র, এই পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে।

ফলের আশায় উদ্বেগ বাড়ে। তবুও এই সামান্য পুস্তিকা যদি গ্রন্থাগারের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে জনগণকে কিছুমাত্র সাহায্য করে তাহলে এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহায়ে এই প্রকাশ। তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

শান্তিনিকেতন,
রাসপূর্ণিমা,
১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৬৭।

বিমলকুমার দত্ত

সূচীপত্র

১।	প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার	১
২।	আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন	১০
৩।	গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা	১৩
৪।	গ্রন্থাগার আন্দোলন	১৮
৫।	শিশুশিক্ষা ও গ্রন্থাগার	২৩
৬।	বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার	২৯
৭।	বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-স্থাপত্য	৩৩
৮।	গ্রন্থাগার ও প্রচার	৩৮
৯।	গ্রন্থাগার না জ্ঞান-ভাণ্ডার	৪১
১০।	গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্রনাথ	৪৩
১১।	ভারতে গ্রন্থাগার অন্দোলন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের টুকিটাকি	৪৮

প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার

বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার বলতে সাধারণত যাহা বুঝায় প্রাচীন কালের সুসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ঠিক সেরূপ গ্রন্থাগার ছিল কিনা বলা কঠিন। তবে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে, প্রাচীন এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, রোম, ভারত ও চীনদেশে বিরাট আকারের গ্রন্থাগারসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাষা বা অক্ষর প্রচলনের বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেযুগে মানুষ সাধারণত আদিম চিত্রশিল্পের সাহায্যে এবং আভাসে-ইঙ্গিতে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করতো। সেজন্য অক্ষর-প্রচলন ইতিহাসের মূল অনুসন্ধান করলে চিত্রাক্ষরের মধ্য দিয়ে অক্ষর-বিবর্তনের ইতিহাসটি নজরে পড়ে। পেপিরাস, তালপাতা বা ভূর্জপত্র ব্যবহারের বহুপূর্ব হতেই পাথর বা পোড়া মাটির উপর লেখার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহা ব্যতীত চীনের হোনান প্রদেশে আবিষ্কৃত সাঙ্ যুগের (১৩-১৪শ খ্রীঃ পূঃ) কতকগুলি পুরা-বস্তুর সহিত অক্ষরযুক্ত অস্থিখণ্ডগুলি প্রমাণ করে যে, পাথর ও মৃত্তিকা ব্যতীত অস্থির উপরও লিখে রাখবার ব্যবস্থা ছিল।[১] কাগজ বা অনুরূপ কোন পদার্থের আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার রীতি ছিল না। সে-কারণ ইহা রাজপ্রাসাদ কিংবা ধর্মগৃহসমূহের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকতো।

১০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে টাইলুন নামক জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম কাগজ আবিষ্কার করেন। অরেল স্টাইনের মতে টাইলুন জীর্ণ বস্ত্রাংশ,

---

[১] *Migration of Paper from China to India.* P. K. Gode. P. 209. (Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona).

গাছের ছাল এবং পশুলোমের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করেছিলেন।[১] কাগজের ইংরেজি প্রতিশব্দ—পেপার। পেপিরাস গাছ হতে কাগজ তৈয়ারী হয় বলে 'পেপার' কথার সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু প্রাচীন মিশরের পুইয়েমরী কবরগাত্রস্থ চিত্র হতে (১৪৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) পেপিরাসের চাষ ও তাহা হতে কাগজ প্রস্তুতকরণের বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২] ভারত, গ্রীস ও আরবদেশ যে চীনের নিকট হতে কাগজপ্রস্তুতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হতে জানা যায় যে, সে-যুগে (৩২০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) ভূর্জ, তাল এবং পত্রম্ এই তিনটি দ্রব্যের উপর লেখাপড়ার যাবতীয় কাজ সমাধা হ'তো।[৩] সম্ভবত ৭ম শতাব্দীতে ভারতে প্রথম কাগজের প্রচলন সুরু হয়, কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়।[৪] ৮ম এবং ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে যথাক্রমে আরব ও গ্রীসদেশে কাগজের ব্যবহার চালু হয়।[৫]

এসিরিয়া ও ব্যাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে স্যর এইচ লেয়ার্ড ও বোটার দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নিনাভে নগরীর খননকার্যের ফলে স্যর লেয়ার্ড এক প্রাচীন গ্রন্থাগারের সন্ধান

[১] *Vide* his report on his Explorations in Central Asia called —Serindia. (Sec. 4, Chap. XVIII, pp. 771-7).

[২] In the tombs of Puyemere (1450 B.C.) there are paintings of Papyrus Harvest. These pictures show how the stalks were pulled up in the marshy lakes, tied up into bundles and carried ashore. The beginning of the paper making is also taking place, for the figure to the right is peeling off the hard exterior coating from one of the stalks. (Egyptian wall paintings of XVIII and XIX Dynasties—*Metropolitan Museum of Art*, New York, 1930),

[৩] Kautilya's *Arthasastra*: Sham Sastry's translation, pp 108, 1929.

[৪] *I-tsing's Record* (671-695). Translated by J. Takakusu, Oxford, 1896.

[৫] *Journal of the American Oriental Society*, June, 1941.

পান। নিনাভে নগরীর উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এক প্রাসাদের কয়েকখানি ঘর ত্রিভুজাকৃতি অক্ষরে লিখিত ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-স্তূপে পরিপূর্ণ ছিল। ইহারা আকারে এক ইঞ্চি হইতে এক ফুট পর্যন্ত। এই মৃত্তিকা-স্তূপগুলি ছিল অসুরবাণী পালের গ্রন্থাগার। প্রায় বিশ হাজার অনুরূপ মৃত্তিকা-স্তূপ পাওয়া গেছে এবং সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাজানো। নিপ্পুরে যে গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হ'য়েছে তাহাতেও দেখা যায় যে, বইগুলি সব আগুনে পোড়ানো মৃত্তিকা-স্তূপ বা মাটির টালি। একটির পর একটি সযত্নে রক্ষিত, যেন পুঁথির এক একখানি পাতা। এই নিপ্পুরেই খ্রীঃ পূ ১৭৮২ অব্দে বেল-এর মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন মিশরে খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বহুসংখ্যক লিপিকার রাজাদেশে রাজার জীবনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী লিখে রাখবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ব্যাবিলনের যুগে হেলিওপোলিশ ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। সেকালে মন্দিরে মন্দিরেও ধর্মগ্রন্থাদি নকল করবার জন্য লেখক নিযুক্ত রাখবার ব্যবস্থা ছিল। মিশরে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুসমূহের মধ্যে লেখক বা লিপিকারের যে সম্পূর্ণ ও সুন্দর মূর্তিটি দেখা যায় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] এডফু নামক নগরীতে যে প্রাচীন গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া গেছে তাহা মন্দিরের একটি গৃহে রক্ষিত এবং মন্দিরের প্রাচীরে গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকাটি উৎকীর্ণ ছিল। মিশরের নানা স্থানে এইরূপ মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাগার এবং ইহা ব্যতীতও দ্বিতীয় পিরামিডের প্রতিষ্ঠাতা খাফরার এবং সম্রাট ফুফুর (IV Dynasty) গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সম্রাট ওসিমানিডাসের গ্রন্থাগার মিশরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরাতন লিপিটিতে

---

১ *Outline of the History of the World* by Davies, p. 22 of 1937 ed.

গ্রন্থাগারটির যে সুন্দর নামকরণ ছিল তাহা হতে বেশ বুঝা যায় যে, সেযুগে গ্রন্থাগারগুলিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হ'তো। ডিওডোরাসের অনুবাদ অনুযায়ী উক্ত প্রাচীন লিপিটির অর্থ "Dispensary of the Soul" অথবা "আত্মার চিকিৎসালয়"। ওসিমানিডাস সম্রাট দ্বিতীয় রামসেস ব্যতীত অপর কেহই নন (১৩০০-১২৩৬ খ্রীঃ পূঃ)। উক্ত গ্রন্থাগারটি পশ্চিম যেবেসে র‍্যামসাউস্ নামক স্থানে রক্ষিত ছিল। এমেন এস হ্যাণ্ট উক্ত গ্রন্থাগারের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। গ্রন্থাগার ব্যতীত বহু রাজদপ্তরখানার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপ একটি রাজদপ্তরখানায় বিখ্যাত টেল-এল-আমরনের লিপিগুলি (১৩৮৩-১৩৬৫ খ্রীঃ পূঃ) আছে। পারসীক আক্রমণে প্রাচীন মিশরের বহু গ্রন্থাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আবার কতক-গুলি হইতে পুঁথিপত্রাদি পারস্যে আনা হয়।

প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠা আন্দোলন সম্পর্কে গ্রীসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, পিসিসট্রেটস্ নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম গ্রীসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। আউলুস সেলুসের নিজের লেখা হ'তে জানা যায় যে, ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে জরথুষ্ট কর্তৃক উহা পারস্যে নীত হয়। জেনোফোন যে ইউথিডেমুসের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন তাহা তাঁহার নিজের লেখা হতে প্রমাণিত হয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সংগ্রাহক হিসাবে ইউক্লিড, ইউরিপিডাস, এরিস্টটল ও প্লেটোর নাম উল্লেখযোগ্য। এরিস্টটলের গ্রন্থাগার বহু স্থান ঘোরার পর অবশেষে রোমে আনীত হয়।

প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারসমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। টলেমী ফিলাডেলফুসের রাজত্বকালে নানাভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উৎসাহিত করা হয়। তিনি নানা দেশ হতে পুস্তক সংগ্রহ করে বিশেষ ভাবে তৈরি একটি গ্রন্থাগারে সেগুলি রাখবার ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার পরবর্তী সম্রাট টলেমী ইউ এর গেটেশ বিদেশী বণিক ও রাজ-দূতগণ যে সমস্ত পুস্তক সঙ্গে করে আনতেন তৎসমুদয় নিজস্ব গ্রন্থাগারে রাখবার জন্য বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করতেন। পুস্তকাধিকারীকে বাজেয়াপ্ত পুস্তকের আসলখানি রেখে একখানি নকল দেওয়া হত।

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে ব্রুকিয়াম ও সেরাপিয়াম নামক স্থানের গ্রন্থাগারদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রুকিয়ামে ৪,৯০,০০০ ও সেরাপিয়ামে ৪২,৮০০ খানি পুস্তক ও পুঁথি রক্ষিত ছিল বলে জানা যায়। সীজার যখন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের জাহাজসমূহে অগ্নি-সংযোগ করেন তখন কোনক্রমে উক্ত গ্রন্থাগার তুইটির মধ্যে বড়টি অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত হয়। ইহার পর হইতে সেরাপিয়ামের গ্রন্থাগারটি প্রধান গ্রন্থাগার হিসাবে গণ্য হত, কিন্তু পরে এণ্টনি উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহার পারগামাসের গ্রন্থাগারটি ক্লিওপেট্রাকে দান করেছিলেন। ক্লিওপেট্রার পরেও বহুদিন পর্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থাগার-কেন্দ্র হিসাব আলেকজান্দ্রিয়ার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেরাসিনদের আক্রমণে আলেকজান্দ্রিয়া চিরতরে বিনষ্ট হয়।

রোমের সমৃদ্ধিকালে সেখানেও কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়। রোমের রাজারা অধিকৃত রাজ্যের সম্পত্তির সহিত গ্রন্থাগারগুলিও স্বদেশে আনয়ন করতেন। ১৬৭ খ্রীঃ পূঃ এমীলাস পলাস মেসিডোনিয়া এবং ৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সুলা এথেন্স হতে লুণ্ঠিত সম্পত্তির সহিতও উক্ত স্থান তুইটির গ্রন্থাগারগুলিকে নিজ নিজ দেশে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট অগাষ্টাস রোমে সর্বপ্রথম সাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। অগাষ্টাসের পর লইবেরিয়াসও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। রাজানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে 'উলপিয়াস' গ্রন্থাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা উলপিয়াস ট্রজান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত

গ্রন্থাগারে রাজকীয় যাবতীয় দলিলপত্রাদি রাখা হত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও পোপ এবং অন্যান্য ধর্মযাজকগণ বিরাট আকারের বহু গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন।

প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে প্রাচীন চীন ও ভারতে গ্রন্থের বা পুঁথির যথেষ্ট সমাদর ছিল। অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য দেশের ন্যায় ভারত ও চীনে পুঁথিপত্র লিখন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য ধর্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। চীনদেশে প্রাচীনকালে সাধারণ পুস্তকাগার ছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে প্রত্যেক রাজদরবারে, সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিগণের গৃহে ও ধর্মমন্দিরে গ্রন্থশালা রাখার বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২২০ শতাব্দীতে চীন সম্রাট কর্তৃক গ্রন্থাদি সংগ্রহের প্রচেষ্টা হতেই প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। সিয়াও-উ ১৩০-৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ কালের মধ্যে পুঁথিপত্র সংগ্রহ ক'রে একত্র রাখবার সুব্যবস্থা করেন। লিউ সিয়াং নামক জনৈক পণ্ডিত ৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সর্বপ্রথম উক্ত গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত হন। ভারতের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চীনে পুঁথিপত্র নকল করার, ভারতীয় হতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করার এবং সেই সকল পুঁথি সযত্নে ও সুশৃঙ্খলায় রাখার প্রচেষ্টা নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। হানদের রাজত্ব-কালে চীনে ভারতীয় সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। প্রায় ১৪০০ ভারতীয় গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অনুবাদক-দিগের মধ্যে 'চা-চিয়েন' ও কুমারজীবের নাম উল্লেখযোগ্য। চা-চিয়েনের অনূদিত 'অবদান শতক', 'সুখাবতী' ও 'মাতঙ্গপুত্র' প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

চীনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সুপ্রচলনের অন্যতম প্রধান কারণ ঐ দেশে সর্বপ্রথম কাগজ ও ছাপার আবিষ্কার।[১] সর্বপ্রথম ছাপা পুথির

[১] *The Invention of Printing in China and Its Spread Westward* by Thomas Francis, New York, 1931.

সন্ধান চীন দেশেই পাওয়া যায় এবং উহা ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হ'য়েছিল বলে জানা গেছে।[১] ইহা বৌদ্ধসূত্র সংক্রান্ত একখানি পুঁথি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বাদ দিলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বেদের যুগই সর্বপ্রাচীন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় আবিষ্কৃত পুরাবস্তু-সমূহের মধ্যে নানা প্রকার শীলমোহরে অক্ষরের প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু আজিও সে-যুগের কোন ধারাবাহিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বৈদিক যুগ ছিল শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ, সে-কারণ গ্রন্থ বা পুঁথিপত্রের আয়োজন সেযুগে খুব কম ছিল।

ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার, প্রচার ও ভারতের বাহিরে তাহা প্রসারলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনসংক্রান্ত তথ্যগুলি লিখে রাখবার প্রয়োজন প্রবলভাবে দেখা দিল।

প্রাচীন ভারতে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিখ্যাত পুঁথিশালা ছিল তাহা প্রমাণিত হ'য়েছে। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ও ইশিংয়ের বা ইচিং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হতে জানা যায় যে, সে-সময়ে পাটলিপুত্র, তাম্রলিপ্ত ও নালন্দায় উন্নত ধরণের বিরাট পুঁথিশালাসমূহ ছিল। ইহাদের মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিব্বতের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, তিনটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় পুঁথিশালাটি রক্ষিত ছিল। অট্টালিকা তিনটির নাম যথাক্রমে—রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। পুঁথিশালার সমগ্র অঞ্চলটি ধর্মগঞ্জ নামে সুপরিচিত ছিল। একমাত্র "রত্নরঞ্জক" গৃহটি নয়-তলাবিশিষ্ট ছিল। ইহা হতে সমগ্র পুঁথিশালা অঞ্চলটির বা সমস্ত ধর্মগঞ্জের একটি আঁচ করা সম্ভব। কোন স্বার্থপর ভণ্ড সাধুর প্ররোচনার ফলে পুঁথিশালাটি অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের

[১] Seligman's article on "The Roman Orient and the Far East.' Smithsonian Report, 1938, pp, 568.

Ancient Indian Education নামক পুস্তকে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের যে বিবরণ আছে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :

After the Turuskha raiders had made incursions in Nalanda, the temples and the chaityas there were repaired by a sage, named Mudita Bhadra. Soon after this, Kukutasiddha, minister of the king of Magadha, erected a temple at Nalanda and while a religious sermon was being delivered there, two very indigent Tirthika mendicants appeared. Some naughty young novice monks in disdain threw washing water on them. This made them very angry. After propitiating the sun for twelve years, they performed a *yajna*, fire sacrifice, and threw living embers and ashes from the sacrificial pit into the Buddhist temples. This produced a great conflagration which consumed Ratnodadhi."

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা নামক পুঁথিশালা দুইটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। প্রথমটি বিহারের এক শহরে ও দ্বিতীয়টি গঙ্গার উত্তর তীরে বিক্রমশীলা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। প্রথমোক্তটি বক্তিয়ার খিলজীর দ্বারা ভস্মীভূত হয়। বিক্রমশীলা ও বাংলার জগদ্দল বিহারের পুঁথিশালা দুইটি ঐ একই ভাবে বিনষ্ট হয়। মুসলমানদের আক্রমণে যখন সমস্ত পুঁথিপত্র নষ্ট হতে সুরু হল তখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কিছু কিছু মূল্যবান পুঁথি সঙ্গে নিয়ে নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে চলে গেলেন।

ভারতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আন্দোলনে জৈনদিগের দানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়ে জৈন সন্ন্যাসীদের আবাস-সংলগ্ন বহু পুঁথিশালা ছিল। পত্তন, সুরাট, কাম্বে ও আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগারসমূহ "জৈন ভাণ্ডার" নামে খ্যাত। পত্তনের জৈন-ভাণ্ডার সম্পর্কে অধ্যাপক পিটারসন লিখেছেন :

"I know of no town in India and only a few in the world which can boast of so great a store of documents of such venerable antiquity. They would be the pride and jealously guarded treasures of any University library in Europe."

১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকে কুমারপাল ও বাস্তুপাল প্রভৃতি বিচক্ষণ সম্রাটদের সাহায্যে এবং উৎসাহে জৈনধর্ম ও জৈনগ্রন্থ পঠন-পাঠনের নানাপ্রকার সুব্যবস্থা হয়। আলাউদ্দিনের আক্রমণের ফলে গুজরাটের জৈনেরা সমস্ত পুঁথিপত্র সহ যশলমীরে পলায়ন করেন। এখনও সে-সকল স্থানে বহু পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

তদানীন্তন কালে দক্ষিণ ভারতে "সরস্বতী-ভাণ্ডার" নামে অসংখ্য গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। আজিও তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানে তাহাদের নিদর্শন দেখা যায়।

প্রাচীন কাল হতে ভারতের বিভিন্ন ধর্মমন্দিরে কিছু কিছু পুঁথিপত্র রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজসাহী, ময়মনসিংহ, পাবনা, ত্রিহুত, মহীশূর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের মঠমন্দিরে রক্ষিত ধর্মপুস্তক-সংগ্রহগুলির কথা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান বিতরণের উপর কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হতো তাহার কথঞ্চিৎ আভাস নিম্নপ্রদত্ত মনুর শ্লোকটি হতে পাওয়া যাবে :

যো দদ্যাৎ জ্ঞানমজ্ঞানম্,
কুর্যাৎ ধর্ম দর্শনম্ ;
স কৎস্নাং পৃথিবীং দদ্যাৎ,
তেন তুল্যং ন তদ্ ভবে।

আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও সর্বজনীন গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান যুগে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মন্দির ও মসজিদে, রাজপ্রাসাদে এবং ধনী ও মানী ব্যক্তিদের স্ব স্ব গৃহে গ্রন্থাগার ছিল বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি। সাধারণের তাহাতে কোন অধিকার ছিল না।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারার পরিবর্তন সুরু হয়। বর্তমান যুগে যেমন রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা পরিবর্তনের ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকাশ ও ধনবণ্টন যজ্ঞের সুরু হয়, তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এতদিন যে অধিকার কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তাহা ধীরে ধীরে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ক্রমশ দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হ'চ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে ভারতবর্ষে জ্ঞান-বণ্টন যজ্ঞের সুত্রপাত হয় এবং ১৮৫০ সালে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ শহরে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল গ্রন্থাগার প্রধানত ইংরাজ-দিগের সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই স্থাপিত হয়। সেকারণ সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে ঠিক যাহা বুঝা যায়—এই সকল গ্রন্থাগার দ্বারা সেকার্য্য পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন হয় নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে ভারতে গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার ও গ্রন্থাগার-আন্দোলনের ক্রমশ প্রসার ঘটে। এই শুভ যজ্ঞের সূচনা

করেন বরোদার মহারাজা। শিক্ষাপ্রসারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে তিনি আমেরিকার জনৈক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারিক বোর্ডেন সাহেবকে তিন বৎসরের জন্য নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ করেন। তিনি ১৯০৭ হতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত বরোদা রাজ্যে গ্রন্থাগার সংগঠন কার্যে সাহায্য করেন।

বরোদায় গ্রন্থাগার-আন্দোলন বিশেষ কার্যকরী হওয়ায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এবং গ্রন্থাগার-আন্দোলনের প্রসার ঘটাবার জন্য অন্ধ্র (১৯১৪), মাদ্রাজ (১৯২৮), বাংলা (১৯২৯), পাঞ্জাব (১৯২৯), বিহার (১৯৩৬), কেরল (১৯৪২) বোম্বাই (১৯৪৪), উড়িষ্যা (১৯৪৪), দিল্লী (১৯৫৩) ও উত্তর প্রদেশ (১৯৫৬) প্রভৃতি প্রদেশে গ্রন্থাগার-সমিতি সকল গড়ে উঠে। ১৯৩৩ সালে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করবার জন্য যাঁরা সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহার পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও ডাঃ রঙ্গনাথম্ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাগার-আন্দোলনের ক্রমশ প্রসার ঘটার ফলে সারাদেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক ও বিভিন্ন চাহিদার দরুন গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন রূপ লাভ করে; যথা, শিশু-গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা-প্রণালী এক ধরণের না হওয়ার দরুন ইহাদের পরিচালনার জন্য নানা শ্রেণীর পারদর্শী গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হয়।

গ্রন্থাগারিকের পদ আধুনিক সমাজজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একাধারে উপযোগী পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ, পাঠক সৃষ্টি, প্রচার-পরিচালনা ও পাঠকদের সহিত বন্ধুভাবে মেলামেশা করা ও উপযুক্ত

পাঠকের নিকট উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পুস্তক ও পত্রিকা সরবরাহ ও অন্যান্য সুযোগদান গ্রন্থাগারিকের কার্য। গ্রন্থাগারকে সক্রিয় ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলবার ভার গ্রন্থাগারিকের।

এই দেশের অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লোকের বিশেষ অভাব। এই অভাব দূর করবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা সুরু করা হয়েছে।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। ভারত সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও দেশময় ব্যাপক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন এবং কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৪০ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়।

জনচেতনা ও সরকারের শুভ ইচ্ছার ফলে আজ সারা দেশময় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সুরু হয়েছে। সেকারণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রন্থাগারিকদের ন্যায় জনসাধারণও গ্রন্থাগার আন্দোলন, বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও তাহাদের কার্যধারার সহিত পরিচিত হ'তে চান। ইহা অতীব শুভলক্ষণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বর্তমান গ্রন্থাগার-আন্দোলন কি হওয়া উচিত এবং কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার ও তাহাদের কার্যধারার সহিত পরিচয় করাবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের অধ্যায়গুলি লেখা হয়েছে। আশা করি ইহা একাধারে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষিত জনসাধারণের আগ্রহ মেটাতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শতাব্দীর পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণ আজ অর্ধ-সচেতন। অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী···এই সব জনসাধারণের মধ্যে চেতনা জাগাবার জন্য। সরকারী প্রচেষ্টায় অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষিত নারী-পুরুষের সাহায্য ব্যতীরেকে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার অসম্ভব। এ কাজে দেশের প্রত্যেককে (যাঁরা শিক্ষিত) এগিয়ে আসতে হবে—তাদের অন্ধ ভাইবোনদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণের জন্য। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার বিশেষ প্রয়োজন। মনে পড়ে লেনিনের সেই ঘোষণা রাশিয়ার কর্মীদের মাঝে ১৯২১ সালে—"মনে রেখো যে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোক কখনও জয়যুক্ত হতে পারে না। সাধারণ সকলে শিক্ষিত না হলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব, সহযোগিতা অসম্ভব ও খাঁটি রাজনৈতিক জীবনও অসম্ভব।"

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে যাত্রা, তরজা, পাঁচালী, কবিগান, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও প্রচার করা হতো, কিন্তু আজকালকার অর্থনৈতিক কারণে ঐ সকল ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের আর একটি প্রশস্ত পথ ছিল—দেশ-ভ্রমণ। তীর্থভ্রমণের অছিলায় এ পথও বহুদিন খোলা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হওয়ার দরুন এ পথও আজ রুদ্ধ।

ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক জায়গায় ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও আন্দোলন দ্বারা দেশের নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে। রাশিয়ার কথা ধরা যাক। রুশ বিপ্লবের আগে ঐ দেশের অশিক্ষিত ও অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা ছিল আমাদের দেশের মতো। রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ও-দেশের শিক্ষাবিস্তারের ধারারও আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই কার্য পরিচালনার ভার পড়ে মুখ্যত Society for Combating illiteracy অর্থাৎ নিরক্ষরতা বিদূরণ সমিতির উপর। শিক্ষাবিস্তার ও প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, স্কুল, কলেজ, শিক্ষাকেন্দ্র (Lenin Corners) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সহজ সরল ভাষায় লিখিত দৈনিক পত্রিকা বাহির করে দেশের জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রুশ সরকার এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য আদৌ কার্পণ্য করেন নাই। জানা যায় যে, কেবলমাত্র য়ুক্রেন প্রদেশের জন্য ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল অর্থাৎ ১০০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিস্তারের সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ঐ দেশের সহিত তুলনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দেশের শিক্ষাবিস্তারের প্রতি সরকারী দরদ কতখানি। একমাত্র ঐরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পশ্চিমের দেখাদেখি, আমাদের দেশেও গত কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগারের মারফতে দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার-আন্দোলন সুরু হয়েছে। কিন্তু ঐ আন্দোলনের সুফলটুকু কেবলমাত্র বড় বড় শহরে খানিকটা ফলেছে···গ্রামে তার রেশ আদৌ পৌছায় নাই। নানান কারণে ক্রমে ক্রমে গ্রামগুলি হতশ্রী হয়ে পড়ছে অথচ ভারতের যথার্থ উন্নতি নির্ভর করছে এই গ্রামের উন্নতির উপর। ভারত যদি গ্রামকে এভাবে আর কিছুদিন অবহেলা করে তাহলে ভারতের হতশ্রী হয়ে পড়তে আর বেশী দেরী লাগবে না।

আজকাল সরকারী তরফ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের বহুল

ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু ঐ প্রাথমিক শিক্ষালাভই কি তাদের শেষ গন্তব্যস্থল ? প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তারা লেখাপড়ার ধার ধারে না ••যেটুকু শিখেছিল তাও চর্চার অভাবে ধীরে ধীরে ভুলে যায়। কিন্তু গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত থাকলে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পরও তারা ঐ সব গ্রন্থাগার থেকে বই পড়তে পারে এবং তার ফলে আয়ত্ত জ্ঞান ক্রমচর্চার দরুন উত্তরোত্তর বাড়তে পারে। এঁদের মধ্যে হয়তো অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর আর গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের ধারে যাবেন না। তাঁদের মধ্যে পড়ার ইচ্ছা জাগাবার ও জ্ঞান-পিপাসা চালু রাখবার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিরূপে কাজ করে তার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

সাধারণ লোক গ্রন্থাগার তো দূরের কথা গ্রন্থের ধার দিয়েও কেউ যান না। গ্রন্থাগারে যদি সাধারণে না আসেন তবে সাধারণের দোরে দোরে যেতে হবে গ্রন্থাগারকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এ ব্যবস্থা চালু করার ফলে সোনা ফলেছে। প্রত্যেক পল্লীতে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে যানবাহনে সজ্জিত গ্রন্থাগার পল্লীবাসীদের দোরে দোরে গিয়ে উপস্থিত হয়। ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য তখন এক-আধটা বই নিতে হয়। প্রথম প্রথম বালিশের তলায় গুঁজে রেখে দেন—ঐ বই ; আবার নির্দিষ্ট দিনে ফেরৎ দেন বইখানি। দুচার সপ্তাহ এইভাবে যাবার পর পল্লীবাসীটির কেমন ইচ্ছা হয়, দেখি তো কি আছে বইয়ের মধ্যে। খুলে দেখেন সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি আর অল্প সহজ ভাষায় লেখা। খাওয়া-দাওয়ার পর রঙীন ছবি দেখতে দেখতে নিত্য ঘুমিয়ে পড়েন, ক্রমশ এই তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকে ঐ নির্দিষ্ট দিনে পল্লীবাসীটি দাঁড়িয়ে থাকে তার ঘরের সামনে উদ্‌গ্রীব হয়ে, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য। নিজে আগ্রহ সহকারে বই খুঁজে বেছে নেন।

এইরূপে কয়েক মাস যাবার পর যখন ধীরে ধীরে পড়ার নেশা জেঁকে বসল তখন ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সে-পথে আসা বন্ধ করল। এতদিন গ্রন্থাগার এসেছিল পাঠকদের দোরে…এখন দেখা গেল পাঠক গ্রন্থাগারের দোরে হাজির।

এছাড়া গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে স্থানীয় রুচী অনুযায়ী চিত্তাকর্ষক ছবি সিনেমার মধ্য দিয়ে দেখানো যেতে পারে। এ সব ছবির মধ্য দিয়ে নানান দেশের, নানান জাতির ও নিজেদের স্বাস্থ্য, শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই সাধারণকে জানানো যায়। যাঁরা পড়তে অপারগ ছবি হচ্ছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

তৃতীয়ত ব্যাপকভাবে জ্ঞানবিস্তারের জন্য সহজ ভাষায় সুন্দর অক্ষরে সচিত্র দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে সাধারণের হাতে অতি অল্প নামমাত্র দামে তুলে দিতে হবে। সংবাদপত্রপাঠের কি উপকারিতা তা বোধ হয় অনেকেই জানেন এবং শেষে উপকারিতার মাত্রার চেয়ে পাঠের নেশা পাঠককে পেয়ে বসে। এই নেশা একবার জাগাতে পারলে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ফল দেয়। একাধারে পড়া ও শেখা দু কাজই হয়। দূর গ্রামে দৈনিক পত্রের অভাব বিশেষ লক্ষণীয়। ক্বচিৎ কখনও একখানা আনন্দবাজার এসে পড়ে মাতব্বরের হাতে…সকলে তাকে বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে ঘিরে বসে, আর হাঁ করে শোনে দেশ-বিদেশের কত অজানা কথা ‥উদ্‌গ্রীব হয়ে। শিক্ষাবিস্তারের জন্য যাতে সস্তায় দৈনিক পত্রিকা সর্বসাধারণের হাতে গিয়ে পৌঁছায় সে-ব্যবস্থা যত শীঘ্র চালু হয় তার জন্য সকল প্রকার আন্দোলন ও সুব্যবস্থা করতে হবে।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতিসমূহের সমকক্ষতা লাভ করতে হলে সর্বপ্রথম দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সচেষ্ট হতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা, বিশেষ করে রাশিয়া স্ব স্ব দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে কৃতকার্য। আমাদেরও আজ সেই পথ

ধরতে হবে, কিন্তু সে-পথে এগিয়ে চলা অত্যন্ত ব্যয় ও আয়াসসাধ্য। নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে যদি কাজ চালানো যায় তবে প্রচেষ্টা সফল হবেই হবে। ব্যয়ের সমস্যাটা হচ্ছে প্রধান সমস্যা। তবে সরকার যদি জনসাধারণের সঙ্গে হাতে হাত মেলান এ কাজে, তবে সহজসাধ্য হবে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট কংগ্রেসে তাঁর বিধবা পত্নী ক্রুপস্কায়া যা বলেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"Do not pay external respect to Lenin's personality. Do not build statues in his memory. He cared for none of these things in his life. Remember there is much poverty and ruin in this country. If you want to honour the name of Lenin—Build Children's Homes, Kindergartens, Schools, Libraries, Ambulatories, Hospitals, Homes for Cripples and other defectives."

গ্রন্থাগার আন্দোলন

জাতির সম্মুখে আজ যে সকল প্রধান প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অন্যতম। কিছুদিন যাবৎ জাতীয় সরকার ও নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে চিন্তা করছেন, কিন্তু আজও তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। বয়স্কদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে যদি একযোগে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহলে অদূরভবিষ্যতে অশিক্ষা-দূরীকরণ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতে পারে। কেবলমাত্র শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নয়—দেশের বেকারসমস্যা সমাধানেরও ইহা একটি প্রশস্ত পথ।

গ্রন্থাগার-আন্দোলন বলতে সাধারণত আমরা কি বুঝি? এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য দেশে শিক্ষা ও সুরুচি বিস্তার করা। বিভিন্ন চিন্তাধারা, পরিবেশ ও শিক্ষাবিশিষ্ট নানা ধরনের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের উপযোগী পুস্তকাদি নিয়মিত পরিবেশন করে তাঁদের শিক্ষা ও রুচির মান উন্নয়ন করাতেই এই আন্দোলনের সার্থকতা।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার করা স্বাধীন দেশের সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সকল দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনই চিরকাল এই সত্য প্রচার করবার চেষ্টা করছে। গ্রন্থাগার-আন্দোলনের খরচ অন্যান্য আন্দোলন পরিচালনা অপেক্ষা অনেক কম; কিন্তু একমাত্র টাকার সাহায্যেই এই আন্দোলনকে সার্থক করা যায় না। ইহাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে হলে একদল কর্মীর নিঃস্বার্থ ও প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেরও এই সকল কর্মীর চেষ্টা যেদিন জীবনব্রতের পর্যায়ভুক্ত হবে সেইদিনই

আমরা এ আন্দোলনকে সার্থক করে এই দেশ হতে অশিক্ষা দূর করতে সমর্থ হব। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কাজ সুরু হলে কর্মীর অভাব হবে না।

আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বেকারসমস্যা এক জটিল আকার ধারণ করেছে। যদি তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেশের গঠনমূলক অনেক কাজে তাদের সাহায্য লাভ করা যায়। গ্রন্থাগার-আন্দোলন পরিকল্পনা যদি জাতীয় সরকার কোনদিন গ্রহণ করেন তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল বেকার যুবকের কাজের সংস্থান করা যাবে। সরকারের ভাবা উচিত যে, এই আন্দোলন দ্বারা যে কেবল বেকারদের চাকুরির সুবিধা হবে তা নয়, দেশের শিক্ষিত যুব-শক্তির নিকট হতে উপযুক্ত পরিমাণে কাজ আদায় করে লওয়া যাবে। তাঁদের সর্বাঙ্গীণ সাহায্য ব্যতীত দেশের কোন ব্যাপক গঠনমূলক কাজে সাফল্যলাভ কোনদিনই সম্ভব নয়।

দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত জাতির মান ও মর্যাদা বাড়াবার অন্য কোন দ্বিতীয় পথ নেই এবং ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাবিস্তার করতে হলে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদিগের সাহায্য অবশ্য গ্রহণীয়। সে-কারণ গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থক করতে হলে চাই সরকারের নিকট যথাযোগ্য অর্থসাহায্য। আশা করা যায়, অন্যান্য স্বাধীন দেশসমূহের ন্যায় আমাদের সরকারও এ ব্যাপারে কার্পণ্য বা দ্বিধা করবেন না। এখন দেখা যাক—গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে কোন পথে পরিচালনা করলে উহা সার্থক ও কার্যকরী হতে পারে।

সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনা ব্যতীত কোন আন্দোলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করা সম্ভব নয়। সরকার যদি গ্রন্থাগার-আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে ইহার পরিচালনার জন্য "গ্রন্থাগার অধিকর্তা" নামে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলন পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই আন্দোলনের

যে ব্যয় তাহার আংশিক সঙ্কুলানের জন্য "গ্রন্থাগার-আন্দোলন আইন" (Library Act) দ্বারা "গ্রন্থাগার কর" ধার্য করতে হবে। অনুরূপ গ্রন্থাগার-আন্দোলন আইন ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে পাস হয়েছে। এই আইনের বলে সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করতে পারবেন। সম্ভব হলে "গ্রন্থাগার অধিকর্তা" সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও সরকারী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত একযোগে কাজ করবেন।

বর্তমানে সাধারণত প্রদেশসমূহের রাজধানীতেই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান" শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, সে কারণ সাধারণের পক্ষে এ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্তু গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থক করতে হলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক চাই। যাতে সাধারণে অল্প ব্যয়ে এই বিজ্ঞান শেখবার সুবিধা পান সেজন্য সরকারী প্রচেষ্টায় প্রতি গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় প্রত্যেক মহকুমার সদরে স্বল্পদিনব্যাপী এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি মহকুমার ছাত্রছাত্রী অল্প ব্যয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মোটামুটি বিষয়গুলি শেখবার সুযোগ পাবেন।

গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ও গ্রন্থাগারগুলি গ্রাম, থানা, মহকুমা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় সদর এই পর্যায়ে স্তরে স্তরে বিভক্ত থাকবে। প্রতি দশখানা গ্রামের কেন্দ্রীয় স্থানে একটি করে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যানবাহনাদির সাহায্যে উক্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হতে দশখানি গ্রামে পুস্তক সরবরাহ করা হবে। সেই সঙ্গে জনশিক্ষার জন্য গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও, শিক্ষামূলক ফিল্ম ও চিত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করা হবে। চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজন।

এইভাবে যখন দেশময় গ্রন্থাগারের [illegible] তখন উহাদের

পরিচালনা ও নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায় হয়তো তারা ভুলপথে চালিত হয়ে অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে। সরকার প্রতি প্রদেশে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষালয়গুলির নিয়মিত তত্ত্বাবধানের জন্য বহু School Inspectors বা বিদ্যালয়-পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। এই সকল বিদ্যালয়-পরিদর্শককে যদি স্বল্পদিনব্যাপী গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিখতে বাধ্য করা যায় তাহলে সরকার একাধারে ইঁহাদের দ্বারা গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের কাজ পেতে পারেন, নূতনভাবে নিয়োগ-ব্যবস্থা করতে হয় না।

সরকারী সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগারসমূহ যদিও সরকারের নিকট হতে অর্থসাহায্য পাবেন তথাপি স্থানীয় জনসাধারণের উপর তাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। গ্রন্থাগারের কার্যব্যবস্থার উপর জনসাধারণের বিশ্বাসই গ্রন্থাগারের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আনার উদ্দেশ্যে প্রতিটি সরকারী সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগারকে সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুয়ায়ী রেজেস্ট্রীভুক্ত হতে হবে।

এই সকল গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশে এই ধরণের প্রাথমিক বইয়ের একান্ত অভাব। যে সমস্ত বই বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় তাদের মধ্যেও কিছু কিছু বই অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক দ্বারা নির্বাচন করে পরিবেশন করা উচিত। স্থানীয় জনসাধারণের রুচি, শিক্ষার মান, জীবনযাত্রার প্রণালী ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রেখে এই নির্বাচন করতে হবে।

সাধারণত শ্রমিক ও চাষী শ্রেণীর লোকেরা দিনের বেলা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। সারাদিনে তাঁদের আদৌ ফুরসত নেই। সন্ধ্যার পর তাঁরা সুবিধা হলে শিক্ষার জন্য এক-আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারেন।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন অংশ হতে প্রায় দুই শত পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক আমেরিকায় এসেছেন। ইঁহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর কিন্তু মার্কিন সরকার নৈশ বিদ্যালয়ের মারফত বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল নিরক্ষর শ্রমিকগণকে শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ উপায়ে আমাদের দেশেও সরকার ইচ্ছা করলে কি অশিক্ষা দূর করতে পারেন না ?

দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ও অশিক্ষার দরুন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ আজ পিছনে পড়ে আছেন। শিক্ষা তো দূরের কথা, কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম—জীবনমরণ সংগ্রাম। ঘুমন্ত লোককে জাগাতে হলে যেমন একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দেওয়া প্রয়োজন, সেইরকম আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে আবার জ্ঞান-পিপাসা ও চেতনা জাগাতে হলে দেশব্যাপী নিয়মিত প্রচারকার্য একান্ত প্রয়োজন। সরকারী প্রচার-বিভাগের, রেডিও, সংবাদপত্র, সিনেমা, বক্তৃতা ও চিত্রাদির সাহায্যে এই প্রচারকার্য চালাতে হবে। প্রচার ব্যতীত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থক করে তোলবার আশা খুব কম।

দেশের শিক্ষা-সমস্যা স্বাধীন জাতীয় সরকারের সর্বপ্রধান সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় দেশব্যাপী বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও গ্রন্থাগার-আন্দোলনের প্রসার ঘটান। দিল্লীতে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা অনুযায়ী কিভাবে কাজ হচ্ছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে গ্রন্থাগারকে কিভাবে সাহায্য করা যায়—এ বিষয় আজ দেশের অনেকেই চিন্তা করছেন।

শিশুশিক্ষা ও গ্রন্থাগার

শিশুই জাতির জনক। শিশুমন গঠন ও শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। জাতিগঠন উদ্দেশ্যে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা প্রত্যেক স্বাধীন জাতির অবশ্য কর্তব্য। আমাদের দেশেও শিক্ষাবিদ্‌রাই এ ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন জায়গায় সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বা সার্থক হয়নি।

অনেক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে স্থির করা হয়েছে যে, সাধারণত সাত থেকে এগারো বছর বয়েসের মধ্যে শিশুরা যে আদর্শ ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, ভবিষ্যৎ জীবনে সেই আদর্শ ও প্রেরণাই তাদের মোটামুটিভাবে পরিচালিত করে থাকে। সেজন্য শিশুর এই বয়ঃ-সন্ধিক্ষণে যাতে সৎশিক্ষা ও উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ পরিচালনা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সাধারণত শিশুরা সাত থেকে এগার বৎসর বয়সকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে থাকে। বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পঠন-পাঠন তো আছেই। তাছাড়া যাতে তারা নানা শুভ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু এবং নানান শুভ প্রচেষ্টায় উৎসাহী ও আগ্রহশীল হয়, সে-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এত অল্প বয়সে শিশুর দেহ ও মনের গঠন অত্যন্ত কাঁচা অবস্থায় থাকে। জোর করে বাধ্যবাধক ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে যথাসম্ভব ঘরোয়া সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা অধিক কার্যকরী হয়। ঘরোয়াভাবে আনন্দের ও খেলার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা ও প্রেরণা দেওয়া যায়, তা যেমন কার্যকরী তেমনি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ বিত্থালয়ে ছাত্রদের বাঁধাধরা শিক্ষা ছাড়া অন্যকিছু জানবার ও শেখবার প্রেরণা দেবার জন্য প্রায়ই প্রতি বিত্থালয়ে একটি করে গ্রন্থাগার রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে অধিক চালু করবার জন্য সরকারী শিক্ষাদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে, গ্রন্থাগার-বিহীন বিত্থালয় সরকারী সাহায্য পাবে না। অত্যন্ত শুভ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব গ্রন্থাগার কতখানি শিশুশিক্ষা ব্যবস্থাকে সাহায্য করছে—সে-খবর কে রাখেন? আর যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, এই সব গ্রন্থাগারকে "গ্রন্থ-গুদাম" বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

এখন দেখা যাক, বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারগুলির আদর্শ কি হওয়া উচিত এবং কিভাবে সেই আদর্শ কাজে ফলানো যায়।

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারগুলির আদর্শের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হচ্ছে—শিশুদের মধ্যে পুস্তক-পাঠের ইচ্ছা ও অভ্যাসকে উৎসাহ দেওয়া। কারণ বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মহামানবদের জীবনী, রোমাঞ্চকর এবং চমকপ্রদ ঘটনাগুলির সঙ্গে শিশুমনকে পরিচিত করবার এইটিই শ্রেষ্ঠ পথ।

দ্বিতীয়ত, পুস্তকপাঠের ইচ্ছা ও অভ্যাস জাগিয়ে শিশুদের শিক্ষকের বা অভিভাবকের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে পুস্তক পড়ে বুঝবার ও আনন্দ পাবার প্রেরণা দেওয়া। সাধারণত শিশুরা এই বয়সে অত্যধিক মাত্রায় শিক্ষক বা অভিভাবকদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার জন্য আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে না। সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। গ্রন্থাগারে নানান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে একই ঘরে শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যবহার ও পুস্তক-পাঠ করার ফলে অল্পদিনের মধ্যে শিশুরা সহজে এবং বিনা আড়ষ্টতায় অপরের সঙ্গে মিশতে ও চলতে পারে। ফলে শিশুরা অতিমাত্রায় লাজুক ও আত্মকেন্দ্রিক হবার সুযোগ পায় না।

সাধারণত শিশুরা বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পাঠ্যপুস্তক আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়। তার একমাত্র কারণ, পরীক্ষা জুজুর ভয়ে। কিন্তু বাধ্যতামূলক পাঠ্যপুস্তক পড়া ছাড়াও আনন্দলাভের বা অধিক জানবার ও শেখবার লোভে যাতে শিশুরা অন্যান্য পুস্তক পড়তে চায়—তার উৎসাহ দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। ভয়ে ভয়ে পড়া আর মজা করে পড়া—এই দুইয়ের মাঝে তফাৎ অনেক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিশুরা তো আদৌ পড়তে চায় না, কেবল খেলা আর খেলা। তাদের আবার পড়ার ইচ্ছা এবং অভ্যাস জাগাব কি করে। বেশ তো, যখন শিশুরা খেলতেই ভালবাসে, তখন বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিক তাদের মধ্যে বেশ মজাদার গল্প করে খেলার মধ্য দিয়ে প্রথম প্রথম তাদের গ্রন্থাগারে আসার নেশা সৃষ্টি করে তুলতে পারেন। আফিংখোর যেমন আফিং খাবার সময়ে যেখানেই থাকুন না কেন, ছুটতে ছুটতে এসে আফিংএর আড্ডায় হাজির হন, তেমনি দেখবেন, মজা করে গল্প বলতে শুরু করলে শিশুরাও ঠিক নিয়মিত গ্রন্থাগারে এসে যথাসময়ে হাজির হবে। এই হ'ল প্রথম কাজ। এর পর একদিন একটা খুব মজার, হাসির বা রোমাঞ্চের গল্প শুরু করে মাঝপথে ছেড়ে দিন। দেখবেন শিশুরা বাকিটা শোনবার জন্য আপনাকে অস্থির করে মারবে। এই অবস্থায় আপনি যে গল্পটা শুরু করেছিলেন, সেই গল্পের বইখানা শিশুদের হাতে তুলে দিন আর বলুন,—"যদি তোমরা বাকীটা জানতে চাও নিজেরা পড়ে নাও।" বই কখানা নিয়ে শিশুদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। এই রকম কয়েকখানা বইয়ের নাম উল্লেখ করা হ'ল ; যথা—

১। ছোট রামায়ণ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

২। ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি—কুলদারঞ্জন রায়

৩। আবোল-তাবোল—সুকুমার রায়

৪। জাপানী ফানুষ—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৫। ক্ষীরের পুতুল—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। ঠাকুরমার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার

৭। আরব্যোপন্যাস—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

এইভাবে ধীরে ধীরে ধৈর্যের সঙ্গে শিশুমনে পুস্তক-পাঠের ইচ্ছা ও অভ্যাস জাগাতে হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ' কাজে অত্যন্ত সাবধানতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন।

গবেষণার ফলে জানা গেছে সাত থেকে এগারো বয়সের শিশুরা সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের পুস্তকাদি পড়তে ভালবাসে। যথা:—

বিষয়	৭—১১ বয়সের	
	ছাত্র ও	ছাত্রী
১। জন্তু জানোয়ারের গল্প	* *	* *
২। রামায়ণ মহাভারত ও রূপকথার গল্প	* *	* * *
৩। প্রকৃতির কথা	* * *	* * *
৪। খেলাধূলার গল্প	* * *	*
৫। দুঃসাহসিকতার গল্প ও ভ্রমণ-কাহিনী	* * *	*
৬। রেলওয়ে, এরোপ্লেন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গল্প ও ছবি	* * *	

এই জাতীয় পুস্তকাদি যথাসম্ভব শিশুদিগের গ্রন্থাগারে রাখা উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র পুস্তক রাখলেই চলবে না। পুস্তকগুলির আবরণ যাতে রঙীন ও ঝকঝকে হয় এবং ছাপার অক্ষরগুলি বড় বড় ও স্পষ্ট হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় পুস্তকপাঠের চেয়ে শিশুরা ছবি দেখবার জন্য পুস্তকাদি নেয়, সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছবির বই রাখা উচিত।

শিশুদের গ্রন্থাগারে যথাসম্ভব কম বাধ্যবাধকতামূলক আইনকানুন থাকা এবং গ্রন্থাগারে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আমেরিকায় ও ইউরোপের অনেক দেশে শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য গ্রন্থাগারটি নানাপ্রকার ছবি, ফলফুল, পুতুলখেলনা ইত্যাদি দ্বারা মনলোভী করে সাজিয়ে রাখে। তাছাড়া শিশুদের গ্রন্থাগারে আসবাবপত্র এমনভাবে তৈরি করায়, যাতে শিশুরা সহজে, আরামে ও ইচ্ছামত বসে পড়তে পারে। শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করানো ও তাদের মধ্যে পড়ার নেশা জাগানো—রাতারাতি চোখ রাঙিয়ে করতে গেলে উলটো ফল হবে। সেজন্য শিশু-গ্রন্থাগারকে সকলের আকর্ষণীয় করবার জন্য উপরোক্ত সকল ব্যবস্থার যথাসম্ভব আয়োজন করা একান্তভাবে উচিত এবং গ্রন্থাগারের যিনি তত্ত্বাবধানে থাকবেন, তাঁকে হতে হবে—জ্ঞানী, গুণী, অশেষ ধৈর্যপরায়ণ, স্থির-ধীর এবং খুশমেজাজী।

এই তো হ'ল শিশুদের মধ্যে পড়ার ইচ্ছা ও নেশা জাগাবার মোটামুটি কথা। কেবল পড়ার ইচ্ছা বা নেশা জাগাতে পারলেই কার্য সফল হল তা নয়। নেশা জাগাবার পর ধীরে ধীরে তাদের প্রকৃতি এবং পারিবারিক পরিবেশ বিচার করে তাদের রুচির মান ক্রমশ উন্নত করতে হবে। ধরুন, একটি ছাত্র বা ছাত্রী কয়েক মাস কেবলই রূপকথা ও রোমাঞ্চকর গল্প পড়ছে। তখন দেখা গেল তার পড়ার নেশা ধরেছে, কিন্তু রুচি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিককে ঐ ছাত্র বা ছাত্রীটির রুচি বদলাবার জন্য বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে কর্তব্য স্থির করতে হবে। এই সব কাজের জন্য ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক পড়ছে তার হিসাব ও তালিকা রাখা প্রয়োজন।

অনেক ছাত্রছাত্রী অত্যধিক পাঠে আসক্ত, কিন্তু পড়ার পর তাদের আর কিছুই মনে থাকে না। এর কারণ, তারা ভাসা ভাসা পড়ে যায়

কিছুই বুঝবার বা ভাববার চেষ্টা করে না। এ রকম পড়ার ফল বিশেষ আশাপ্রদ হয় না। সেজন্য শিশু-গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে শিশুদের পড়া বই থেকে গল্প বলার বা আবৃত্তি করবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। তবে এ সমস্তই একান্ত খেলার ছলে হাসিখুশির মধ্যে পরিচালনা করতে হবে। পড়ার নেশা জাগাবার জন্য মাসান্তে বা বৎসরান্তে সর্বাপেক্ষা অধিক পুস্তক-পাঠককে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী হয়।

আমাদের দেশে সামাজিকতার একান্ত অভাব—এমনকি অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সচরাচর কেউ পরিচয় করিয়ে দেন না। শিশু-বয়স থেকে সামাজিকতা প্রসারের জন্য তাদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা ও গ্রন্থাগারের মারফতে বনভোজন বা নানাপ্রকার শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত। দেখা যায়, এর ফলে শিশুবয়স থেকে তারা বেশ সহজ, অনাড়ম্বর ও মিশুক হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য হয়তো সবক্ষেত্রে এই সকল ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হয় না কিন্তু শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও জাতিগঠনে তার সার্থকতার কথা চিন্তা করে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আর যে কাজগুলির জন্য অর্থের প্রয়োজন নেই বা প্রয়োজন খুব কম, সেগুলি অনায়াসেই পরিপূর্ণ করে দেশের এবং জাতির ভবিষ্যৎগঠনে সাহায্য করা সর্বতোভাবে উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার

আমাদের দেশের জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দেশময় ব্যাপক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের সুষ্ঠু পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ ব্যবস্থার অভাব আমাদের দেশে বিশেষ করে চোখে পড়ে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা আদৌ সুপরিকল্পিত ও সুসংযোজিত নয়। আধুনিক উন্নত দেশগুলির গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার মাপকাঠিতে আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগার অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। এমন কি তাদের অনেককে গ্রন্থাগারের পর্যায়-ভুক্ত না করলেও বিশেষ অন্যায় বা অযৌক্তিক হবে না। একমাত্র এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি অনেকখানি সার্থকতার পথে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আজও তাদের সবাই এখনো সম্পূর্ণ সার্থক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে নি। তবুও তাদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাজ করবার একটা প্রয়াস আছে এবং এই আন্তরিক প্রয়াস ও যত্ন খুবই আশাপ্রদ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এদেশের জ্ঞানের আলোক এতদিন জ্বালিয়ে রেখে এসেছে ও আজও রাখছে। আর ঐ জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রাখবার জন্য প্রদীপে তেলের সরবরাহ করেছে ও আজও করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি। আজকের দিনে জ্ঞানের সীমানা অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি এতদিন যে-আলো জ্বালার ব্যবস্থা করে এসেছে আজ সে-আলোয় আর কাজ চলছে না—চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আরও বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক ক্ষেত্রে আলো পরিবেশনের জন্য পুরানো ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির প্রধান কাজ হচ্ছে উচ্চ-শিক্ষার্থিদের তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ানুযায়ী জ্ঞানান্বেষণের পথে যথাসম্ভব

সাহায্য করা। এজন্য শুধু গ্রন্থাগারে প্রাপ্য পুস্তকাদির সরবরাহ করাই যথেষ্ট নয়। উচ্চ শিক্ষার্থীকে তাঁর অন্বেষণের বিষয়-সংক্রান্ত যথাসম্ভব সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকা করে দিতে হবে, গ্রন্থাগারে না থাকলেও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আনিয়ে অথবা সংগ্রহ করে দিতে হবে ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ঐ ধরনের কোন আলোচনা বা অন্বেষণ হ'চ্ছে কিনা সে-সকল তথ্যের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করে দিতে হবে। তবেই এই সকল জ্ঞানান্বেষিরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মারফতে নূতন নূতন চিন্তাধারা পরিবেশন করে জাতিকে ও দেশকে সমস্ত পৃথিবীর সামনে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারবেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে সর্বশুদ্ধ ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং তাদের মধ্যে চারটি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ নিষ্প্রাণ গ্রন্থের আগার মাত্র—আদর্শ অনুযায়ী সেবা করার সুযোগ-সুবিধা এখনও সব জায়গায় ঘটে ওঠেনি। এমন কি অনেক গ্রন্থাগারে আজিও অনুলয়-সেবা· (Reference Service) দপ্তরটির কোন ব্যবস্থা নাই। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যদি উপরোক্ত দপ্তরটির ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তাকে কলেজ গ্রন্থাগারের সমগোত্রীয় করা চলে।

একথা অনেকেরই মনে হয়, এদেশে এত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা প্রতি বৎসর এত অধিক সংখ্যায় শিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা করেন কেন? কারিগরী-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিদেশে যাওয়া কেন? সত্যই কি আমাদের দেশে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে? আমার মনে হয় শিক্ষকের অভাবের চেয়েও আমাদের গ্রন্থাগার ও লেবরেটারীর অভাব বিশেষ করে চোখে

পড়ে। উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও লেবরেটারী ব্যতীত উচ্চশিক্ষা লাভ বা নূতন জ্ঞান পরিবেশন করা একান্তই অসম্ভব।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির সংখ্যা মোটামুটি কাজ-চলনসই; কিন্তু হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু অনুযায়ী মোট সংগ্রহের ভারসাম্য নাই। হয়তো কোন একটা বিষয়ের যেমন দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকাদির সংগ্রহ প্রাচুর্যে ভরপুর, কিন্তু অন্য বিষয়ের সংগ্রহে অনুরূপ দৈন্য আবার পীড়াদায়ক। সর্বশুদ্ধ মোট গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ (সকলবিষয়ানুপাতে) ভারসাম্যের অভাবগ্রস্ত। এইজন্য সকলের পক্ষে এই সব গ্রন্থাগারের কাজ করার সুযোগ-সুবিধা খুবই কম।

এখন দেখা যাক, এ অভাব মেটান যায় কি করে। একমাত্র উপায় হচ্ছে পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির নিজেদের মধ্যে বিষয়ানুযায়ী একটা আপোষ ভাগবাঁটরার ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাদের নিজেদের মধ্যে যদি মোটামুটি একটা আপোষ হয় যে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র দর্শন, ধর্ম, প্রাচ্যদেশের ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা; বারানসী বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা (সকল শ্রেণীর); আলিগড় ইসলামীয়—দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য (প্রাচীন ও আধুনিক) ও দিল্লী সমাজতত্ত্ব, সাধারণ জ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য দেশের ইতিহাস, সাহিত্যে ভাষাতত্ত্ব ও শিল্পের যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা সংগ্রহ করবে। এই ভাবে বিষয়ানুযায়ী সংগ্রহ করার ফলে পৃথিবীতে প্রকাশিত যে-কোন বিষয়ের যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যাবে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে। এছাড়াও প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষাকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি সাধারণ সর্ববিষয়ের সংগ্রহ গড়ে তুলবেন।

আমাদের দেশ গরীব দেশ ; সেকারণ সব গ্রন্থাগারে সব বিষয়ের সব ভাষার পুস্তকাদি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা নিছক উন্মাদ প্রচেষ্টা। তা কিছুতেই সার্থক বা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সেইজন্য উপরি-উল্লিখিত ব্যবস্থানুযায়ী ভাগবাঁটরার একান্ত প্রয়োজন। যদি ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই রকম আপোষ-ব্যবস্থার মধ্যে যোগ দেন তাহলে কাজটা অনেক সুবিধাজনক ও সহজ হয়ে যায়। আর গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহভারও লাঘব হয়।

ইহার পর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে অনুলয়-সেবা দপ্তরের (Reference Dept.) মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার-সূচী অনুযায়ী পুস্তক-তালিকা প্রকাশ, পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের আয়োজন করতে হবে। যে সকল উচ্চশিক্ষার্থী অধিকতর জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক তাঁহারা স্ব স্ব বিষয়ানুযায়ী পুস্তক-পত্রিকাদির সম্পূর্ণ সাহায্য পাবার জন্য যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঐ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ সংগ্রহ রাখবার ব্যবস্থা আছে সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারেন।

আমার মনে হয় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সকল প্রয়োজনীয় তথ্যে সম্পূর্ণ করতে হলে, প্রাচীন পন্থা ছেড়ে নূতন ভাবে নূতন পথের সন্ধান করতে হবে। ইহা ব্যতীত জাতীয় শিক্ষার মান ও মর্যাদাকে উচ্চ আসনে বসাইবার আর অন্য কোন পথ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-স্থাপত্য

গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব অনেকখানি। হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ ও সক্ষম না থাকলে মানুষ যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ ও সক্রিয় না হলে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণসত্তা প্রকাশের একান্ত অভাব ঘটে।

উচ্চশিক্ষাদান এবং গবেষণা দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার হতে নূতন তথ্যাদি আবিষ্কার ও প্রকাশ করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদের হাতে তাঁদের স্ব স্ব চাহিদামত উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বই ও পত্রিকাদি সরবরাহ করে তাঁদের কাজে সাহায্য করা গ্রন্থাগারের কর্তব্য। দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এবং গ্রন্থাগার পরস্পরের কাজে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেজন্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থান ও দান বিশেষ সুস্পষ্ট।

গ্রন্থাগারকে সক্রিয় ও সম্পূর্ণ করতে হলে চাই—আধুনিক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অনুযায়ী সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার-গৃহ। গ্রন্থাগার-গৃহ সুপরিকল্পিত না হলে—পাঠক, বই ও গ্রন্থাগারকর্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এর ফলে অনর্থক শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সুপরিকল্পিত নয়। সে কারণ শক্তি ও অর্থের অপব্যয় এবং অন্য দিকে কাজের সুবিধার অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে।

আধুনিক জগৎ গ্রন্থাগার-স্থাপত্য নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করছেন এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগার-গৃহকে যথার্থ রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে আমেরিকাতে এবং ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার-স্থাপত্য নিয়ে যে সব আলোচনা ও পরিকল্পনা চলেছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে আর নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বেড়ে চলে গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা। এই সকল ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের প্রয়োজনমত উপযুক্ত পুস্তকাদি আনান, সেগুলি যথাযথ রাখার সুব্যবস্থা করা, পুস্তকাদি আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত ও দ্রুত কার্যকরী এবং অনুলয় সেবাকে (Reference service) প্রাণবন্ত করা গ্রন্থাগারিকের কাজ। গ্রন্থাগারিকের উদ্দেশ্য হবে এই সব ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যের মাধ্যমে সফল ও সক্রিয় রাখা এবং প্রচার-ব্যবস্থার দ্বারা গ্রন্থাগারের সাদর আহ্বান সকলকে জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ পুস্তক, পত্রপত্রিকা, মানচিত্র, চিত্র-সংগ্রহ, সংবাদপত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড ও মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি রাখা হয়। এই সব জিনিসের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী রাখার ব্যবস্থা না করলে ব্যবহারের সুবিধা হয় না। পত্রিকাগুলি যদি গুদামজাত হয়ে থাকে, পুস্তক ও তার কার্ডগুলি যদি সহজে দেখা না যায়, পুঁথি-শালায় যদি রেকর্ড বাজাতে হয় বা মানচিত্রগুলি টাঙ্গিয়ে রাখা হয় তা হলে এগুলো রাখার সার্থকতা কোথায়? এই সব বিশেষ বিশেষ জিনিসের ব্যবহারের জন্য বিশেষ স্থান ও আসবাবের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অনেকগুলি বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমষ্টি। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এই সব বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনা করা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সকল বিভাগীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাদির ও নিজস্ব সূচী রাখা এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আদান-প্রদান ব্যবস্থা সহজ করা। পূর্বে একটি বিরাট জমকালো গ্রন্থাগার-গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ের পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদি একত্রে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে,

এ ব্যবস্থা আদৌ সুব্যবস্থা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগগুলি স্থানে স্থানে ছড়ান। প্রতি বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রকে যদি তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ের পুস্তকাদি দেখা ও পড়ার জন্য প্রতিবার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আসতে হয় তা হলে যথেষ্ট সময়ের অপব্যবহার হয়। তা ছাড়া আলোচনার সময় যদি সেই বিষয়সংক্রান্ত পুস্তাকাদি হাতের কাছে না থাকে তা হলে কাজেরও অসুবিধা হয় অনেক। এই সকল দিক বিবেচনা করে বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিচালনায় বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পড়াশুনার যাতে সুবিধা হয় সেই দিকে সর্বাগ্রে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। বিভাগীয় গ্রন্থাগার চালু করার ফলে দ্রুত আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষ ভাবে সাহায্য-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বিরাট জমকালো থামওয়ালা বাড়ী ছবিতে দেখতেই ভাল কিন্তু গ্রন্থাগারের পক্ষে এরূপ বাড়ী কতখানি কার্যকরী সে-বিষয়ে ভাবা দরকার। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারও আগে ঐ রকম বড় বড় থাম ও গম্বুজওয়ালা জমকালো বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু কাজের অসুবিধা হওয়ায় এবং অযথা আলঙ্কারিক সৌন্দর্য-রক্ষায় স্থান অপচয়ের জন্য তারা নূতন পরিকল্পনা করে গ্রন্থাগার-গৃহের নূতন রূপ দিয়েছে। এই গৃহের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য কার্যকারিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে স্থানের আবশ্যকতা খুব বেশী। কারণ সেখানে (১) নূতন বইপত্রাদি রাখার গুদাম, (২) বইপত্রাদি গ্রন্থাগারে ব্যবহার উপযোগী করবার দপ্তরখানা, (৩) বইপত্রাদি ব্যবহারের জন্য রাখবার উপযুক্ত স্থান, (৪) অনুলয় সেবা ও আদান-প্রদান বিভাগের প্রশস্ত ব্যবস্থা, (৫) দপ্তরীখানা, (৬) দামী ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখার বিশেষ ব্যবস্থা, (৭) ফটো কপি করবার স্বতন্ত্র ঘর, (৮) প্রচার দপ্তর, (৯) পাঠকদের ধূমপান ও আরাম কক্ষ এবং (১০) সংবাদপত্র

মানচিত্রাদি রাখার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা চাই। এ ছাড়া পাঠকদের বসবার ও কাজ করবার জন্য যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা ত রাখতেই হবে। সেজন্য গ্রন্থাগারগৃহ নির্মাণের পূর্বে এই সকল বিষয়ের প্রতি সচেতন না থাকলে পরিকল্পনা সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় গ্রন্থাগারের কাজও ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সেজন্য পরিকল্পনার সময় বর্তমান সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে সজাগ থাকা উচিত।

সর্বাপেক্ষা বেশী স্থানের চাহিদা হয়—বইপত্র রাখার ও পাঠকদের বসবার ব্যবস্থার জন্য। আধুনিক মত অনুযায়ী প্রতি পাঠকের জন্য ২৫ বর্গফুট স্থানের ও যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। বই রাখার জন্য তাকগুলি যেন ৭ ফুটের বেশি উঁচু না হয়। তা হলে বইপত্র পাঠকের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

গ্রন্থাগারের মধ্যে শব্দ ও প্রতিধ্বনি যাতে না হয়, তাপমাত্রা যাতে সুসংযত থাকে, বাইরের ধুলা ও পোকামাকড় যাতে সহজে ঢুকতে না পারে এবং অগ্নিনিরোধক ও যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা থাকে সে সকল দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনায় একাধারে স্থপতি ও গ্রন্থাগারিকের সাহায্য প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের চাহিদা বিশেষ ধরনের। সে কারণ যে-কোন গৃহ গ্রন্থাগার-গৃহ হবার উপযুক্ত নয় এবং যে কোন স্থপতি গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনার অধিকারী নন।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ৫ দফা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত :

১। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন সুপরিচালনার সহায়ক হয় ;

২। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন গ্রন্থাগারের সকল কাজের জন্য অযথা শক্তি ও অর্থের অপচয় দূর করে ;

৩। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন আড়ম্বরহীন সহজ ও সুন্দর হয় ;

৪। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কাজের অনুকূল হয় ;

৫। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন পাঠক, বই ও গ্রন্থাগারকর্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষার সহায়ক হয়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন গ্রন্থাগার-গৃহের পরিকল্পনা করেছেন। শীঘ্রই গ্রন্থাগার-গৃহ নির্মাণের কাজ সুরু হবে এবং আশা করি, ভবিষ্যতে আধুনিক চিন্তাধারায় পরিকল্পিত এই গ্রন্থাগার-গৃহটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-স্থাপত্যের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হবে।

গ্রন্থাগার ও প্রচার

আধুনিক রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বিবর্তনের যুগে 'প্রচার' কথাটি সাধারণতঃ বিকৃত অর্থেই পরিচিত কিন্তু 'প্রচার' কথাটির অন্য আর একটি দিক সাধারণতঃ চোখে পড়ে না, যেখানে প্রচারকার্য সৃষ্টি ও গঠনের সাহায্যকারী। গ্রন্থাগার ও প্রচার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রচারের এই শুভ ও সৃষ্টিধর্মী রূপটি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। উহাদের ব্যবহারের গণ্ডীরেখা যতই আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ততই দেশের ও দশের মঙ্গল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি তাদের ব্যবহারের গণ্ডীরেখার আয়তন বাড়াবার জন্য প্রচারকার্যের সাহায্য নেবেন কি ?

বিশেষভাবে পরীক্ষামূলক আলোচনার দ্বারা জানা গেছে যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহে উহাদের ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৫০ জন মাত্র নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে আসেন, আবার তাদের মধ্যে অধিকাংশই পরীক্ষা পাশের ভয়ে। খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিশুদ্ধ আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে আসেন।

আমার মনে হয় গ্রন্থাগারে যে সকল ছাত্রছাত্রী আসতে নারাজ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর তুলনায় তাদের জন্য গ্রন্থাগারিকদের অধিক চিন্তা করা উচিত। কি ভাবে চেষ্টা করলে গ্রন্থাগারে ঐ সকল ছাত্রছাত্রী সহজে আসতে চান সে সম্বন্ধে সক্রিয় চিন্তার প্রয়োজন। গুটিকয়েক ভাল ছাত্রছাত্রীর জন্যই কেবল চিন্তা না করে সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত ছাত্রসমাজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভাবধারা ও তাহাদের সামগ্রিক মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করতে হবে।

আমাদের দেশে 'গ্রন্থাগার ও প্রচার' আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই ভাববেন যে, গ্রন্থাগারে ঠাঁই নেই, সেল্‌ফে বই নেই, বই কেনার টাকা নেই, সে ক্ষেত্রে প্রচারকার্যের আলোচনা হাস্যকর। কিন্তু "নেই নেই" বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো আর চলবে না……পিছিয়ে থাকার মধ্যে গৌরব নেই……দরিদ্রতাকে নিষ্কর্মার বর্মরূপে ব্যবহার করা বেশী দিন চলে না। নিষ্ঠা, চেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে এই 'নেই নেই'-দেশকে 'আছে আছে'—দেশে রূপান্তরিত করতে বেশী দিন সময় লাগে না। তাছাড়া যে কাজ চালাবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদের উপর ন্যস্ত…তাকে সম্পূর্ণ চরম ও পরম করে তোলার চেষ্টা করা সব সময়েই উচিত। এ আদর্শ না থাকলে গতানুগতিক কাজ চালান যায় মাত্র কিন্তু আদর্শ ও সৃষ্টিমূলক কোন নূতন কাজ করা সম্ভব হয় না।

আমরা জানি প্রচারকার্যের মাধ্যমে অন্যান্য দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ সুফল ফলেছে। নিত্য নূতন পাঠক সৃষ্টি করে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিদিন ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চলেছে—পরিপূর্ণ সার্থকতার দিকে। যদি সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রচারের সুফল পাওয়া যায় তবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে ভাল ফল পাওয়া যাবে না কেন?

তবে এতদিন যেভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে প্রচার করা হচ্ছে—আজকের যুগে যেখানে মানুষের মন নিত্য নূতন কারণে ও উত্তেজনায় বিক্ষিপ্ত, সেভাবে কাজ চালালে আর চলবে না। উপরন্তু একই দাওয়াই সব মানুষের সব অসুখে ভাল ফল দিতে পারে না। সেকারণ বিভিন্ন ছাত্রগোষ্ঠীর ভাবভঙ্গি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি আলোচনার পর বিভিন্ন ছাত্রগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্নরূপ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে কার্য পরিচালনা করা উচিত ঃ—

(১) ছাত্রগোষ্ঠীর যাঁরা গ্রন্থাগারে আসেন, তাঁদের পাঠ্যবিষয় কি

এবং কি ধরনের ও বিষয়ের বই গ্রন্থাগারে পাঠ করেন তাহা দেখা উচিত।

(২) ছাত্রগোষ্ঠীর যাঁরা গ্রন্থাগারে আসেন না তাঁদের গোষ্ঠী-ইতিহাস, চাল-চলন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি সবিস্তারে বিচার করা উচিত।

(৩) ছাত্রগোষ্ঠীর ইচ্ছা ইত্যাদি বিরূপ বা অস্বাভাবিক হলে মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্যে ঐ সকল প্রকৃতির বিশ্লেষণ আবশ্যক।

(৪) বিভিন্ন ছাত্রগোষ্ঠীর ইচ্ছা, পছন্দ ইত্যাদি মনে রেখে তাদের গ্রন্থাগারে আসবার জন্য প্রলুব্ধ করতে বিশেষভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থানুযায়ী প্রচারকার্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৫) গ্রন্থাগার কর্মীদের ও ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে সহজ মেলামেশা রাখা উচিত।

গ্রন্থাগার না জ্ঞান-ভাণ্ডার

বর্তমানে গ্রন্থাগার বা পুস্তকালয় বলতে আমরা যাহা বুঝি তাহার উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য-প্রকাশক কোন নাম যেন আমরা খুঁজে পাইনি। সেজন্য যাঁরা ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্যে বই-পত্রাদি সংগ্রহ করে রাখেন তাঁরা বিনা দ্বিধায় তাদের সংগ্রহশালাগুলির নাম গ্রন্থাগার বা পুস্তকালয় রাখছেন। আবার সেই এক নামই জ্ঞানানুশীলনের জন্য রাখা বই-পত্রাদির সংগ্রহশালাগুলির উপরও ব্যবহৃত হচ্ছে। উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ায় এই দুই প্রকার সংগ্রহশালার বিভিন্ন নাম থাকা উচিত নয় কি?

এই নামের গোলমাল আমাদের দেশের মত ইউরোপের দেশে খুব চোখে পড়ে। মার্কিনী দেশে বইয়ের দোকানগুলির নাম ক্রমশঃ Book Store ব্যবহার করে এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা চলছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকালের মাপকাঠিতে ইউরোপ-আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশ বনেদী জাত। আভিজাত্যের গৌরবে আমরা গর্বিত। আমাদের দেশের জ্ঞানানুশীলনের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু জ্ঞানানুশীলনের জন্য রাখা বই-পত্রাদির সংগ্রহশালা সমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচিত হয়নি। বর্তমানে উপরোক্ত বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছি এবং ইহার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে এই সকল সংগ্রহশালা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কি কি নাম দেওয়া হয়েছিল?

তিব্বতী ইতিহাস হতে জানা যায় যে, নালন্দায় গ্রন্থাগার-অঞ্চলটি 'ধর্মগঞ্জ' নামে অভিহিত হ'ত আর গ্রন্থাগার-অঞ্চল-সংলগ্ন তিনটি পৃথক পৃথক সংগ্রহশালাকে যথাক্রমে 'রত্নসাগর', 'রত্নোদধি' ও

"রত্নরঞ্জক" বলা হ'ত। ইহাদের মধ্যে 'রত্নসাগর' নামক গ্রন্থগৃহটি ছিল নয়তলা। দাক্ষিণাত্যে যে অসংখ্য ও মহামূল্য পুঁথিশালা সকল গড়ে উঠেছিল তাদের নাম ছিল—'সরস্বতী-ভবন' আর পশ্চিম ভারতে জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে-ওঠা অসংখ্য পুঁথিসংগ্রহশালা-গুলি 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' নামে পরিচিত ছিল।

ভারতের মুসলমান রাজত্ব নূতন ধারায় শিক্ষা-দীক্ষা প্রবর্তনের জন্য এক গৌরবময় যুগ। একদিকে যেমন তাঁরা বিধর্মীদিগের শিক্ষালয় ও অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস করেছেন অন্যদিকে রাজশক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ সংগঠিত হ'য়েছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ 'কিতাবখানা' নামে পরিচিত। এর পর আসে ইংরাজী নাম 'লাইব্রেরী' এবং কথাটি বাংলা ভাষায় ও ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রবর্তিত বিভিন্ন ভারতীয় ও অভারতীয় নাম-তালিকা হ'তে বুঝতে পারা যায় যে, এদেশে কালে কালে গ্রন্থাগারের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝাবার জন্য নানান নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এই সকল নামের মধ্যে 'সরস্বতী-ভবন' ও 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' নাম দুইটি এই সকল প্রতিষ্ঠানের সঠিক উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে সক্ষম। 'সরস্বতী-ভবন' নামটি বিশেষ ধর্মগত হওয়ার জন্য উহার কথা বাদ দিলাম কিন্তু 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' নামটি বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

বর্তমান গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে পুঁথি-পত্রের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান বর্ধন করা। উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক এই উভয় কার্যেই সাহায্য করে থাকেন। এই কারণে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাতে গ্রন্থাগার, পাঠাগার, পুস্তকালয়, লাইব্রেরী, পুঁথিঘর প্রভৃতি প্রচলিত নামগুলি অক্ষম। 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' নামটি সকল দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মনে হয় যেমন সুন্দর তেমন সর্ব স্পৃএবং সর্বভারতে এই নাম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্রনাথ

ভারতের যুগপ্রবর্তক সার্থক দ্রষ্টা ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকবি। গ্রন্থাগারিকের কাজ তিনি কোনোদিন করেননি। তবু কবিকে গ্রন্থাগারিক আখ্যা দেওয়া হ'ল কেন? আইনের চোখে কাজ করা ও কাজের উৎসাহ দেওয়া দুইই সমান। এমন কি শেষেরটি প্রথমের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের সার্থকতা উপলব্ধি ক'রে গ্রন্থাগার কি, শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের কোন্ পথে চলা উচিত ও প্রকৃত গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য কি, এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন ও চিন্তাশীল লেখার মধ্য দিয়ে দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য সম্মেলনগুলিকে ও গ্রন্থাগারিকদের উৎসাহ দিয়েছেন। সূক্ষ্মবিচারে তিনি সার্থক গ্রন্থাগারিক। বাঙলার অপূর্ব সম্পদ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার— গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্রনাথের অন্যতম পরিচয়পত্র।

বিশ্বকবির ভাষায়—"হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!" এমনভাবে বোধ হয় পৃথিবীর আর কেউ কোথাও গ্রন্থাগারের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করতে পারেননি। এ যেন সাধক গ্রন্থাগারিকের নির্জন গ্রন্থাগারের মধ্যে বহুদিন সাধনার পর গ্রন্থাগারের প্রকৃত সত্তার স্বরূপ প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে আর ডবলিউ এমারসনের কয়েক ছত্রের কথা মনে পড়ে—

"In a library we are surrounded by many hundreds of dear friends but they are imprisoned by an enchanter in these paper and leathern boxes." তুলনামূলক আলোচনায় বিশ্বকবির প্রকাশের কাছে এমারসন নিষ্প্রভ ও ক্ষীণ।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার নিষ্প্রাণ গ্রন্থের আগার মাত্র। মনে পড়ে কবিগুরুর সেই কয়েক ছত্র :

"পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহগিনীর মঞ্চ জুড়ি'
পঞ্চহাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা
আস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা।"

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যখের ধনের মত মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণকেই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করেন। যে অমূল্য সম্পদ গ্রন্থাগারের স্তরে স্তরে রক্ষিত, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারলে কতখানি কার্যকরী হয় সে বিষয়ে কেউ চিন্তা করেন না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের এই দোষ লক্ষ্য করে লিখেছেন : "Most libraries are possessed with this passion for accumulation... When a millionaire comes into a gathering all vie with one another to do him honour, an honour not dependent on what he has to give, but merely on what he has. Much in the same way, the bigness of all libraries is estimated by the number of its volumes. The facilities offered for their use that should have been its glory, are not deemed necessary for its pride."

কয়জন গ্রন্থাগারিক নির্ভীকভাবে এরূপ সমালোচনা করেছেন? কবির ভাষায় "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" গ্রন্থাগারকে দেশের শিক্ষাবিস্তারের

সহায়ক করতে হলে এই কাগজে বাঁধাপড়া কালো অক্ষরগুলিকে মুক্ত ক'রে সক্রিয় ও জনপ্রিয় করতে হবে। সে পথের সন্ধানও তিনি দিয়েছেন। "Consider, for instance, the case of a library which takes in a number of periodicals, published at home and abroad. If some one on the staff made it his duty regularly to compile a list of the specially interesting articles and hang it up in a conspicuous place, would that not immensely increase the chances of their being read ? As it is, thre e-fourths of them remain unopened, encumbaring the space and burdening the shelves as they keep on accumulating. The same is the case with new books."

কবির উপরোক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তি থেকে বোঝা যায় যে, গ্রন্থাগারকে সক্রিয় ও জনপ্রিয় করবার জন্য প্রয়োজন প্রচারকার্যের। এই প্রচারকার্যের অভাব আমাদের দেশের গ্রন্থাগারসমূহে বিশেষ লক্ষণীয়। ইউরোপে, বিশেষ করে রাশিয়ায় ব্যাপক প্রচারকার্যের দ্বারা সাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট ক'রে দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে চলেছে।

খাঁটি গ্রন্থাগারিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি গ্রন্থাগারের দোষ-গুণ লক্ষ্য করেছেন। সাধারণ লোক গ্রন্থাগার তো দূরের কথা, গ্রন্থের ধার দিয়ে যান না। গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করবার জন্য গ্রন্থাগারের পণ্ডিতী খট্‌খটে আবহাওয়ার বদলে সহজ ঘরোয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। পাঠক যেন কোনক্রমেই অসুবিধার মধ্যে না পড়ে বা নিজেকে আড়ষ্ট ক'রে না তোলে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"That library alone can be called hospitable which shows an eagerness to invite readers to the feast at its disposal. It is such hospitability that makes a library big, not its size. That the readers make the library is not the whole truth ; the library likewise makes the readers."

এই সহজ ঘরোয়া আবহাওয়া সৃষ্টি দ্বারা পাঠক-সংখ্যা বাড়িয়ে গ্রন্থাগারকে সার্থক কার্যকরী ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান করা যায়। গ্রন্থাগারকে সক্রিয় ও জনপ্রিয় করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কিছুই এড়িয়ে যায়নি। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"...the librarian's duty should not be confined to those that he can gather, but he must also keep himself acquainted with all those others that are published from time to time, subject by subject."

এছাড়াও পাঠকের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মেশা—আকর্ষণীয় প্রচারপত্র দ্বারা সাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা—উপযুক্ত পাঠকের হাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বই সরবরাহ করা ও পুস্তক নির্বাচন, এই সব হচ্ছে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য।

"The worth of a librarian I would gauge by his power of attracting and looking after...and of acting as the intermediary for an intimacy of relasionship between reader and library. That is to say, on him is cast the burden not only of the books, but of their readers as well."

অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১৯২৮ খ্রীঃ নিখিল ভারত গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচন করা হয়, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি উক্ত সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর লিখিত প্রবন্ধটি স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় পৃথিবীর অনেক মনীষী গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলেছেন ও লিখেছেন। তাহলে তাঁদের সবাইকে গ্রন্থাগারিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কি না, এ প্রশ্ন ওঠে। একথা সত্য যে,

অনেকেই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করেছেন, কিন্তু গঠনমূলক দিক দিয়ে, যেমন গ্রন্থাগার পরিচালনা, গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, পাঠকচিত্ত জয়ের উপায় ও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খুব কম মনীষীই ভেবেছেন ও দরদী চেষ্টায় সে সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এইখানেই অপরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের যে বিপুলায়তন আজ দেখা যায়—তা বিশ্বকবির ঐকান্তিক চেষ্টার ফল।

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সব পাতাই রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়াচ পেয়ে যেন পূর্ণজীবন লাভ করেছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন সে পরশ থেকে বাদ যায়নি। আমাদের দেশে আজকাল গ্রন্থাগার অন্দোলনের একটা ঢেউ দেখা যাচ্ছে; ক্ষীণ হলেও এ আন্দোলন খুব আশাপ্রদ ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন অভিনব পথ ও মতের ভেতর দিয়ে পাঠকচিত্ত জয়ের চেষ্টা চলছে, কিন্তু ঐ কাজে দরদের অভাব লক্ষণীয়। দরদী গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় পাঠকগণকে গ্রন্থাগারে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আজ আমরা আবার সেই ভাষায় সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি—"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থানপতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে! এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে না।

"কত নদী, সমুদ্র, পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো—এখানে এসো—এখানে আলোকের জন্ম-সঙ্গীত গান হইতেছে।"

ভারতে গ্রন্থাগার-আন্দোলন
ও
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের টুকিটাকি

১। ভারতে প্রথম আধুনিক ভাবধারায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯০৭ সালে বরোদা রাজ্যে।

*　　*　　*

২। ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক "The Punjab Library Primer" ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৩। ভারতে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রথম পত্রিকা "The Library Miscellany" ১৯১২ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

*　　*　　*

৪। ভারতে প্রথম সরকার পরিচালিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯১৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়।

*　　*　　*

৫। ভারতে প্রথম মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩১ সালে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা হয়।

*　　*　　*

৬। ভারতে প্রথম বেসরকারী নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৩৩ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।

*　　*　　*

৭। ডাঃ রঙ্গনাথর্ম, প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগার বর্গীকরণের নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন ১৯৩৩ সালে। ইহা কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা নামে খ্যাত।

*　　*　　*

৮। ভারতে সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়।

* * *

৯। ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী কোর্স প্রথম ১৯৪৮ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত হয়।

* * *

১০। ভারতে প্রথম আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার দিল্লীতে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

১১। ১৯৫১ সালে প্রথম ভারতে নিখিল এশিয়া গ্রন্থাগার সম্মেলন ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হয়।

* * *

১২। গ্রন্থাগার-আন্দোলন ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের উপর ভারতীয় গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাদির প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে।

* * *

১৩। ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ডাঃ রঙ্গনাথম ১৯৫৭ সালে "পদ্মশ্রী" উপাধি লাভ করেন।

* * *

১৪। ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়।

* * *

১৫। ১৫৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতে প্রথম ছাপাখানা আনা হয় পর্তুগাল থেকে।

* * *

১৬। ১৫৫৭ সালে Doutrina Christa নামক প্রথম বই গোয়াতে ছাপা হয়।

*　　*　　*

১৭। ১৫৫৮ সালে ভারতীয় অক্ষরে প্রথম ছাপান পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা Doutrina Christaর মালয়লম অনুবাদ।

১৮। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৩৫,০০০ গ্রন্থাগার আছে।

*　　*　　*

১৯। ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রায় ৭৫ লক্ষ গ্রন্থ সঞ্চিত আছে।

*　　*　　*

২০। গ্রন্থাগারের জন্য ভারতে জনপ্রতি প্রতি বৎসর এক পাইয়েরও কম খরচ করা হয়।